প্রথম আলো

তারিখ ...31 JAN 2015...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...১...

ছাত্রদের বিজ্ঞান-অনীহার সমাধান কী

শি ক্ষা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

যাঁরাই বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের উচ্চশিক্ষার গতি-প্রকৃতি লক্ষ করেছেন, তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন যে ছাত্রছাত্রীরা এখন শিক্ষার বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানকে ক্রমেই কম বেছে নিচ্ছে। আগে খুব মেধাবী ছাত্ররা যারা অবধারিতভাবে বিজ্ঞান ও গণিতকে বেছে নিত, তারাও এখন তা সেভাবে করছে না। যারা আদৌ বিজ্ঞান ধারায় থাকছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বেছে নিচ্ছে বিজ্ঞানের ফলিত শাখাগুলোকে এবং বিভিন্ন প্রকৌশলবিদ্যাকে, মৌলিক বিজ্ঞানকে নয়। ব্যবসায় প্রশাসন এবং কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞানই এখন সব ধরনের ছাত্রেরই পছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত দশকগুলোতে বিজ্ঞান-বিমুখী এবং বিশেষ করে মৌলিক বিজ্ঞান-বিমুখী প্রবণতার প্যাটার্নগুলো দেখলে এর কারণ বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। স্পষ্টত, ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবকেরা গোড়া থেকেই লেখাপড়ার ব্যাপারে একটি 'কষ্ট-বেনিফিট' হিসাব কষে ফেলেন! তাতে তাঁদের কাছে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার 'কষ্ট' তার 'বেনিফিটের' চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে, যা ব্যবসায় প্রশাসনের ক্ষেত্রে বা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেভাবে নয়। এই বেনিফিটটি সরাসরি চাকরির ব্যাপার—চাকরির প্রাপ্যতা এবং তাতে বেশি বেতনের সম্ভাবনা। আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনীতির প্রবণতাগুলো লক্ষ করলে 'কষ্ট-বেনেফিট' হিসাবের উল্লিখিত বিবেচনাটিকে দোষ দেওয়া যায় না। প্রধানত ট্রেড ও সার্ভিসনির্ভর প্রাইভেট সেক্টরের ওপরই দেশের অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ নির্ভর করছে; আর সেটিই উচ্চশিক্ষিতদের যথেষ্ট সংখ্যায় এবং বেশি বেতনে চাকরি দিতে সক্ষম। এ কাজে ব্যবসায় প্রশাসন, কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞান, প্রচার ও গণযোগাযোগ ইত্যাদিতে ভালো শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁদের কাছে বেশি দাম পায় এবং সেই সঙ্গে কিছু প্রকৌশলী এবং ফলিত বিজ্ঞানের মানুষ। এ রকম একটি দৃশ্যপটে বিজ্ঞানশিক্ষা নিরুৎসাহিত হওয়াটি অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়।

আমার বক্তব্য হলো, কষ্ট-বেনিফিটের ওই হিসাবের মধ্যে জরুরি সবকিছুর বিবেচনা আসেনি, আসা উচিত ছিল। মৌলিক বিজ্ঞান না পড়ারও একটি বড় কষ্ট আছে, সেটি হলো একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতার প্রতিযোগিতায় জাতিকে বন্ধ্যা করে ফেলার কষ্ট। এর অর্থ হলো শুধু সোনার ডিম আমদানি করে ব্যবসা চালানোর চেষ্টা করা, আর অন্যদিকে যে হাঁস ওই ডিম দেয়, তার সঙ্গে ক্রমে সংস্রবহীন হয়ে পড়া। আরও একটি কষ্ট আছে, তা হলো ছাত্রদের দিক থেকে। অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞানের রহস্যের পেছনে ছোটার যে স্বাভাবিক উৎসাহ ও নেশা শৈশব থেকেই থাকে, সেটি কষ্ট-বেনিফিটের পাল্লায় পড়ে তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়া।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও মানবসম্পদ ব্যবহারের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমার কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে, যেগুলো আমাদের জন্য একেবারে নতুন নয়। এক. স্কুলে অন্য সবকিছুর সঙ্গে সবার মধ্যেই বিজ্ঞানের রহস্যের দিকটি উন্মোচিত করতে হবে, আনন্দময়ভাবে বিজ্ঞান ও গণিত সবাইকে শেখাতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণির পরও তা সবার জন্য অব্যাহত রাখতে হবে। অর্থাৎ স্কুল পর্যায়ে আগের মতো সবার জন্য সব মৌলিক বিষয় রাখতে হবে বিজ্ঞানসহ। দুই. বিজ্ঞানে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় মৌলিক বিজ্ঞানের একটি বিষয়কে 'মেজর' বিষয় করে এর সঙ্গে বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের অন্য কিছু শাখা এবং বিজ্ঞানবহির্ভূত কিছু পছন্দের বিষয় (ব্যবসা, ভাষা, কলা, সমাজ) আবশ্যিক অথবা ঐচ্ছিক 'মাইনর' হিসেবে রাখতে হবে। এ পর্যায়ে মেজর বিষয়টিকে অতিমাত্রায় বিস্তৃত, বিশেষায়িত ও দুর্লঙ্ঘ্য করে না ফেললে এটি খুবই সম্ভব। একই কথা সমাজবিজ্ঞান, কলা বা ব্যবসায় প্রশাসনের স্নাতক শিক্ষার জন্যও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একেবারে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি নয়, কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে পারার শিক্ষা। তিন. সত্যিকার বিশেষায়িত ও দুর্লঙ্ঘ্য শিক্ষার কাজটি হবে পরে স্নাতকোত্তর পর্বে, দুই বছরে এবং সেটি করবে সীমিতসংখ্যক ছাত্র; যারা অলিম্পিক খেলোয়াড়দের মতো বিশেষায়িত শিক্ষার সত্যিকার দুর্গম, কঠিন পথ পাড়ি দেবে। তারা মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ হয়ে এগুলোর শিক্ষা, গবেষণা ও দিকনির্দেশনার নেতৃত্ব দেবে।

গণিত উৎসবের বিজয়ীরা

এখন দেখি, মূল সমস্যাটির সমাধান কীভাবে হবে। শৈশব থেকে কৈশোরের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে বা গণিতকে ভয়ের বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত না করে আনন্দের বিষয় হিসেবে শেখালে কী ঘটতে পারে, তা সে-ই ভালো বুঝবে, যে হাওয়াই বাজিতে কখনো আগুন ধরিয়ে দিয়ে দেখেছে। আমার বিশ্বাস, ওই ছাত্রদের অনেকের কাছে এরপর ও কষ্ট-বেনিফিট বিশ্লেষণ বেশি কাজ করবে না, হাওয়াই বাজির মতো তারা পছন্দের বিষয়ে কল্পনার ডানা মেলবে।

দুঃখের বিষয় হলো, বিগত বছরগুলোতে আমরা নিজেদের অজান্তে এর বিরুদ্ধেই কাজ করে এসেছি। ক্রমাগত বিজ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, এটি কঠিন হচ্ছে—এ অজুহাত দেখিয়ে আমরা এইচএসসির অঙ্ককে বা সেখানকার বিজ্ঞানের কাঠিন্যকে নবম শ্রেণিতে নিয়ে এসেছি, একইভাবে স্নাতকের কাঠিন্যকে এইচএসসিতে নিয়ে এসেছি, স্নাতকোত্তরকে স্নাতকে এনেছি—শুধু এটি বোঝাবার জন্য যে ব্যাপারটি মোটেই ছেলেখেলা নয়, এর জন্য অনেক কঠিন সময়, অনেক কসরত (এবং কোচিং) দিতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে আমরা ওপরে ওপরে অনেক কঠিন কথা বলছি, অনেক জটিল অঙ্কের মহড়া দিচ্ছি, কিন্তু তলায় ভিত্তি ও সৃজনশীলতার খাতে ফাঁকা রেখে দিচ্ছি। ওটিকে, যদি ভরাট রাখতে হতো, তাহলে স্কুলে, এইচএসসিতে কাঠিন্যের মাঝে মাঝে একটু বিরাম থাকা দরকার ছিল, যা হলো আনন্দময় শিক্ষার বিরাম, বিষয়ের পটভূমি (কনটেক্সট) দেখার বিরাম, বিষয়ের ধারণা (কনসেপ্ট) আত্তীকরণের ও তাকে নিজের নেশার মধ্যে নেওয়ার বিরাম। বিজ্ঞানশিক্ষায় এই যতি, এই বিরাম ফিরিয়ে দিলে তাকে আর সাংঘাতিক একটি কষ্ট বলে মনে হবে না, বরং এটি শুধু আনন্দময় হবে না, হবে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। অনেকের কাছেই তখন স্নাতক পর্যন্ত বিজ্ঞানশিক্ষা আগ্রহভরে কাম্য হয়ে উঠবে এবং তা কর্মজীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হবে, শুধু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নয়।

বিজ্ঞানে স্নাতক শিক্ষায় একই সঙ্গে দুটি কাজ করতে হবে। পটভূমি, ধারণা ও প্রয়োগসমৃদ্ধ হয়ে খুব বেশি বিশেষায়িত না হয়েও এটি মৌলিক বিজ্ঞানে সাধারণভাবে ছাত্রকে পটু করবে; একই সঙ্গে ভাষা, যোগাযোগ, দুনিয়াদারির জরুরি ও ফলিত বিষয়গুলোতেও যথেষ্ট সক্ষম করে তুলবে। শেষোক্ত ওই রকম সক্ষমতার জন্যই চাকরিদাতারা আজকে বিবিএর ছাত্রদের এত পছন্দ করছে। কিন্তু আধুনিক ব্যবসা, আধুনিক কর্মকাণ্ড ক্রমেই সাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতা দাবি করছে, সামনে আরও করবে। সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত রকমের বিজ্ঞান স্নাতক, বিবিএর চেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ততা নিয়ে আসবে চাকরিদাতাদের জন্য।

বিজ্ঞানের স্নাতক শিক্ষায় দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হবে, তা হলো যে অল্পসংখ্যক ছাত্র এরপর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যাবে, তাদের জন্যও উপযুক্ত একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি করা, অর্থাৎ সেই সীমিতসংখ্যক অলিম্পিক খেলোয়াড়ের জন্যও এটিই উপযুক্ত খেলার মাঠ হতে হবে। খুব বিশেষায়িত না করেও যদি আমরা এর সত্যিকার পটভূমি, ধারণা, ভিত্তিমূল ইত্যাদি যথেষ্ট নিগূঢ়ভাবে স্নাতকে দিতে পারি, তাহলে এরাও সেখানে বিশেষভাবে অবগাহনের সুযোগ নেবে, তাদের সক্ষমতা ও কল্পনাশক্তিকে তীক্ষ্ণ করবে এবং স্নাতকোত্তরের অলিম্পিকের জন্য তৈরি হবে, স্নাতক পর্যায়টিকে তুচ্ছ বা অতি সহজ মনে না করে। প্রয়োজনে তাদের জন্য শেষ বছর একটি পৃথক ঐচ্ছিক 'অ্যাডভান্সড পেপার' থাকবে, যেখানে তারা অলিম্পিকের মহড়া দেবে। সব ছাত্রকে স্নাতকোত্তরের এই অলিম্পিকে যেতে হবে, এমন চিন্তা মোটেই স্থান দেওয়া উচিত হবে না। বাকি সবাই বিজ্ঞান স্নাতক হিসেবে বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে এবং সব ক্ষেত্রে অন্য স্নাতকদের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করবে। সব কাজে 'মাস্টার্স' খোঁজার (অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামে মাত্র) অভ্যাস আমাদের ছাড়তে হবে।

স্নাতকোত্তরের ওই অলিম্পিক খেলোয়াড়ের, অলিম্পিকে জিতে এলে তাদের নিয়ে আমরা কী করব? তারা মৌলিক বিজ্ঞানে ও বিজ্ঞানধর্মী সৃজনশীলতায় নেতৃত্ব দেবে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণাকেন্দ্রে তো বটেই, এমনকি হাইস্কুলে এবং নানা রকম ভবিষ্যৎমুখী শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও। তাদের দিতে হবে সেই অলিম্পিকের মূল্য, সম্মান ও বেতন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও এটি নিশ্চিত করতে হবে—সফল শিক্ষকদের ও গবেষকদের এবং সর্বোপরি তাদের সৃজনশীল কাজের বেতন ও সম্মান সর্বোচ্চ রাখতে হবে। স্নাতকোত্তর পড়াশোনাকে সত্যিই অলিম্পিকের মতোই খাঁটি ও দুর্লঙ্ঘ্য করতে হবে এবং এর মূল্যায়নকেও। এটি সব রকম স্নাতকোত্তরের জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিত, শুধু বিজ্ঞানের জন্য নয়। এটি বাস্তবায়িত হলে ডাক্তারি, প্রকৌশল, আইন ইত্যাদি প্রফেশনাল শিক্ষা ছাড়া বাকি সব স্নাতকোত্তর শিক্ষা হবে মূলত দুই রকম—এক. মৌলিক ও খুবই বিশেষায়িত বিষয়ে স্নাতকোত্তর; দুই. সত্যিকার মানসম্মত এমবিএ। দ্বিতীয়টিতে বহুসংখ্যক বিজ্ঞান স্নাতকসহ বিভিন্ন রকমের মেধাবী স্নাতকেরাই এমবিএ পড়তে আসবে, এখনো আসছে। যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে তাদের কাছ থেকে অনেক উচ্চ প্রত্যাশা থাকবে। আর প্রথমটিতে 'মৌলিক বিষয়ের স্নাতকোত্তরেরা ওপরে বর্ণিত শিক্ষা, গবেষণা, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, দিকনির্দেশনা ইত্যাদির অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো গ্রহণ করবে। এই শেষোক্তদের ছাড়া আধুনিক কোনো জাতি চলতে পারে না। তাই যত তাড়াতাড়ি এটি বুঝতে পেরে এ ধরনের শিক্ষা-সংস্কারগুলো আনতে পারি, ততই মঙ্গল।

● ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম : অধ্যাপক, বিজ্ঞান লেখক।